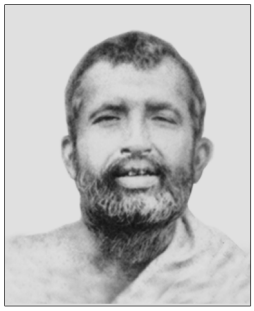

আজকের দৈনন্দিন জীবনে কথামৃত

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত অখণ্ড বা খণ্ডাকারে ভক্তসমাজে অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থের সমাদর লাভ করেছে। মনে রাখতে হবে যুগে যুগেই এই অমৃতবর্ষণ হয়েছে। সেই ধারাসারকে সঞ্চিত করা সহজ ছিল না। জ্ঞানের অবতার ব্যাসদেব সাক্ষাৎ গীতার বচনামৃত সংরক্ষিত করেছিলেন একদিন—যা যুগ যুগ ধরে মানুষের অধ্যাত্মতৃষ্ণা নিবারণ করেছে এবং আজও করছে। ভগবান যিশু ও ভগবান বুদ্ধের বাণীও লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাঁদের শিষ্য ও শিষ্যপরম্পরার মাধ্যমে। একমাত্র আচার্য শংকর ছাড়া ভাষ্যরচনা করে সনাতন ভাবকে শাস্ত্রীয় ভাষায় নিবদ্ধ করেননি কেউ। তাঁরই অনুসরণে রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ ভাষ্যের আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ মতকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব-ভাবসাধনার শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করিয়েছিলেন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রভৃতি শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায়। সনাতন ধর্মভাবনার অঙ্গ হিসেবে বৈষ্ণবসাধন এক স্থায়ী ভিত্তিভূমি লাভ করেছিল।

এবারের প্রেক্ষাপট যেন একেবারে পৃথক মাত্রায় অন্য ভাবে অনুরঞ্জিত ছিল। বিদেশীয় হাবভাব, রীতিনীতি, আদবকায়দা ঘিরে ধরেছিল সেদিনকার কলকাতা মহানগরীকে। এমন গভীর বিজাতীয় প্রলেপ অন্যযুগে পড়েনি। বহুযুগের সংস্কৃতভাষার অনুশীলনও ধীরে ধীরে লোপ পেতে চলেছে। ইংরেজি ভাষার রমরমায় ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট। বাংলাভাষাকে সাহিত্যের বাহন করতে তৎকালীন সাহিত্যসেবীরা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন। পুরোনো দিনের চর্যাপদ, পদ্য, মঙ্গলকাব্যের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে ভাষা সত্যিই নতুন রূপ নিয়েছিল। মুদ্রণব্যবস্থারও উন্নতি মিশনারিরা করেছিল খ্রিস্টের ধর্ম প্রচার ও প্রসারের তাগিদে।

এতদিন পরে সেকালের সামগ্রিক উত্থানের অন্তরালে একটা নতুন আলোর পথ তৈরিরই মহৎ পরিকল্পনা যেন দেখতে পাই। বাংলাভাষার কাননে ফুল ফোটাবার জন্য যে শ্রম করছিলেন সাহিত্যিক গোষ্ঠী তার সার্থকতা কোনদিক দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হবে তা নির্ণয় করা ছিল কালসাপেক্ষ। বলা যায় ধীরে ধীরে কালেরই ইঙ্গিতে নতুন দিনের বেদমন্ত্র ফুটে উঠল আলোর অক্ষরে, যার আজকের নাম—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'—যা রচিত হল জনসাধারণের মুখের ভাষায় অর্থাৎ কথ্যভাষায়।

বাংলাভাষায় এই অমৃতমন্ত্রের ঋষি এযুগের অবতারপ্রবর। তিনি যুগের চোখে নিরক্ষর, দীনহীন, পূজারি ব্রাহ্মণমাত্র। বলতে গেলে কলকাতার অভিজাত

মহানগরীতে তিনি যেন একান্ত অপরিচিত অতি সাধারণ মানুষের একজন। কেশবচন্দ্র সেন তখনকার দিনে ইংরেজি বলিয়ে-কইয়ে, ব্রাহ্মসমাজের মানী নেতৃস্থানীয়। তিনিও তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য 'নববিধান' রচনা করলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের ভাব নিয়ে, মন্ত্র নিয়ে প্রার্থনা প্রবর্তন করলেন। সেখানে 'পিতা নোঽসি...' থেকে শুরু করে বিচিত্র ব্রাহ্মসংগীতে উপাসনা। স্বহস্তে রচনা করলেন 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'। সেই বইতে তিনি অদ্বৈতমত খণ্ডন করে দ্বৈতমতের উপযোগিতা প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের যাগযজ্ঞগুলির ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে আর্যসমাজের প্রবক্তা হলেন। সনাতনপন্থী পণ্ডিত যেমন শশধর তর্কচূড়ামণি প্রচলিত মন্ত্রের বিচিত্র ব্যাখ্যা করে চমক লাগালেন বিদ্বৎসমাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেরকম কিছুই করলেন না। সাইনবোর্ড দেওয়া হল না বক্তৃতা শোনাবার জন্য। অথচ কোনওরকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই দলে দলে শিক্ষিত মানুষ আসতে লাগলেন তাঁর মুখের কথা শুনতে। পদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিঃসৃতা বাণী হল ভগবদ্‌গীতা—তার মহিমা এই যে, সে শাস্ত্র পড়লে, 'কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ'—অন্য শাস্ত্রের বিস্তারিত পঠন-পাঠনের আর প্রয়োজন কই! এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত বাণী শুনলেও বহু শাস্ত্র পাঠের আবশ্যক হয় না। এ যেন শাস্ত্রের জলবৎ তরল রূপ যা অনায়াসে আপামর জনসাধারণ পান করে তৃপ্ত হয়। ভক্ত কবি তাই লিখছেন গীতের ছন্দে :

''বঙ্গহৃদয়গোমুখী হইতে করুণাগঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়।''

এবার করুণাগঙ্গা সত্যই প্রবাহিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীকণ্ঠ থেকে। সেই করুণার অমৃতধারায় আজকের যুগ অভিষ্ণাত বললে অতিভাষণ হয় না। আমাদেরই অভিজ্ঞতায় দেখছি শতসহস্র ভক্ত নিত্য ওই কথামৃত পাঠ করে সংসারে বাস করতে করতে ঈশ্বরকে দুহাতে ধরে কেমন নির্লিপ্ত থেকে সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন, কেমন শান্তভাবে সামাল দিচ্ছেন! কী প্রশান্তির সঙ্গে মৃত্যুবরণও করছেন!

আজ যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিশ্বজুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে হাতে হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উদারতম বার্তা ও আশ্বাস পৌঁছে দিচ্ছে, তার শুরু করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ গৃহী ভক্ত শ্রীম বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি নিজে গুপ্ত থেকে ব্যক্ত করেছেন আজকের ভাষায় এক বেদতুল্য অমৃতবচন। এই উচ্চ প্রেরণাদায়ক বাণীর অন্তরালে যে মহাজীবন স্পন্দিত, সেই জীবনকে জানার জিজ্ঞাসা জেগেছিল সেদিন অগণিত ভক্ত ও জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে। সেই দুরন্ত জিজ্ঞাসা মেটাতে কলম ধরতে হয়েছিল স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে। সে অমূল্য গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল 'মায়ের বাড়ি' নির্মাণের অর্থ-ঋণ শোধ করার আকাঙ্ক্ষার ছলে। সেদিন কে-ই বা জানত যে মহামানবের অনন্ত জীবনসম্পদ সেই ঋষিকল্প মহাপুরুষ জাতির হাতে গচ্ছিত রেখে গেলেন! সে গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। এই মহাগ্রন্থের মূল্যায়ন কঠিন হলেও অনুবাদের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। কিন্তু কথামৃতের সমাদর যেন তারও আগে আগে পথ তৈরি করে চলেছে। সেই সহজ ভাষার সহজ আবেদন অগণিত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে তাদের জীবনবোধকে জাগিয়ে তুলছে। কথামৃতের সঙ্গে সঙ্গে যেন ফিরছে মহাবতারের অপূর্ব আশীর্বাদ—''তোমাদের চৈতন্য হোক।''

আশ্চর্যের কথা আমাদের শ্রীশ্রীমা, যিনি স্কুল-কলেজের আপাত শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি কথামৃত শুনে এক আশ্চর্য পত্র লিখিয়েছিলেন মাস্টারমশাইকে যেটি আশীর্বাদ-বাণীরূপে শ্রীম তাঁর কথামৃত গ্রন্থের শুরুতে সংযোজন করেছেন। সে পত্র কথামাত্র নয়, কথামৃতের প্রকৃত মূল্যায়ন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ওপর স্থির আলোকসম্পাত। সেই পত্রটি সকলেই জানেন তবু আবার স্মরণ করে তুলে ধরছি : ''এক সময় তিনিই তোমার কাছে ওই সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ওই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হবেক নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য।... একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন।''

চৈতন্য উদ্বোধনের মহৌষধ এই কথামৃত—বলতে গেলে সদসৎ-চৈতন্যহারা যুগের এ হল নতুন পুরিয়ার মধ্যে সঞ্জীবনীমন্ত্র। সত্তার জাগরণ বা চৈতন্যের মন্ত্রই চিরকাল বিতরণ করেন যুগাবতার। তিনি তিরোধানের পরেও আবির্ভূত হয়ে এই গ্রন্থপাঠে ভক্তদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

ঠাকুর ভক্তটিকে 'ঝুনো সরষে' বলে ডাকতেন। তাঁরা কয়েকজন একটি স্থানে কথামৃতপাঠ করতেন। সেই পাঠ বন্ধ করেছিলেন বলে ঠাকুর স্বয়ং তাঁর নাম ধরে রাত্রে এসে পাঠ আবার আরম্ভ করতে বলেন। শ্রীমকে একদিন ঠাকুর হঠাৎ ডেকে বলেছিলেন—''এই মুখ দিয়ে ভগবান কথা কন, সেইজন্য অবতার। তা থেকেই বেদ বেরিয়েছে। এইখানে (অর্থাৎ ঠাকুরের কাছে) আনাগোনা করলেই হবে।''[১]

ঠাকুরের সন্তান হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) মাস্টারমশাইকে বলেছেন : ''কথামৃত যে পড়ে, সেই বলে এতে কি এক মোহিনী শক্তি আছে। শাস্ত্রের মধ্যে যত সব জটিল সমস্যা, এতে তার সমাধান করা আছে। তিনি যেন একেবারে নিজের হাতে কলম ধরে করিয়ে নিয়েছেন নির্ভুলভাবে। কথামৃত পড়ে অনেকে সাধু হতে আসে।''[২]

শ্রীম একথা শুনে বলেছিলেন যে কথামৃতে তিনি ঠাকুরের ফোটো তোলবার চেষ্টা করেছেন। তবে সে শুধু কালির আঁচড়ে তাঁর চিত্র নয়, সে হল কলিযুগের পটে নতুন শাস্ত্রবাক্যের মহাচিত্রণ। সেখানে কথার সঙ্গে মানসপটে উঠে আসে এযুগের অবতারের ঐশ্বর্যবিহীন জ্ঞান-ভক্তি, ত্যাগ-বৈরাগ্যের মিলিত বিগ্রহ। শোনা যায়, কথামৃত লেখার সময় শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন।

আজ ছাপাখানার দৌলতে শ্রীম-র তপস্যার ধন ঘরে ঘরে, ভক্তদের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। কী অদ্ভুত গ্রন্থ! যে কোনও পাতা থেকেই পড়া শুরু করা যায়! বেশি একসঙ্গে পড়লে গুরুপাক—আবার খুলে দ্বিতীয়বার দেখতে হয়। এত বেশি মণিমাণিক্য ছড়ানো সেখানে যে, তাঁরই ভাষায় বলতে হয়—চিনির পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পিঁপড়ে ভাবে সবটাই নেবে, কিন্তু একটি দানার বেশি তার নেবার শক্তি নেই। তবু মনে ইচ্ছা পাহাড়টাকেই নিয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দময়ীর সামনে সাধক রামপ্রসাদেরও তাই-ই মনে হয়েছিল—''আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।''

গুচ্ছের শাস্ত্র পড়ে ঈশ্বরলাভ হয় না, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন—একথা অবশ্যই সত্য কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসঙ্গে বলা হয় যে মাত্র সাতদিন শুনেই রাজা পরীক্ষিতের মন ঈশ্বরচেতনায় ভরপুর হয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছিল। তিনি অনায়াসে পার্থিব দেহের মৃত্যুভয় অতিক্রম করে 'অভীঃ' হয়েছিলেন।

কথামৃতের কথা যেন মত্ত মানুষের কাছে চালধোয়া জলের মতন, যে জল খাইয়ে খাইয়ে আসবপানের প্রভাবে মত্ত মানুষের চেতনা ফেরানো হত। কাম-কাঞ্চনের মোহে আচ্ছন্ন এযুগের মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে তুলেছে এই কথামৃত, যেজন্য আজ আমরা দেখি আসন্নমৃত্যু বহু ভক্তেরই কথামৃত শোনার গভীর বাসনা। কথামৃত যেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই অমৃতস্বরূপ। তাঁরই সত্তা—যা মৃত্যুকে জয় করার অফুরন্ত শক্তি জোগায় ভক্তহৃদয়ে। মনকে উঁচু সুরে বেঁধে দেয়। তাঁর অপূর্ব উপমাগুলি চেতনার উন্মেষ ঘটায় পদে পদে। দৈনন্দিন জীবনে কথামৃত পাঠ বা সাপ্তাহিক ক্লাসে ক্লাসে পাঠ অথবা স্বাধ্যায়ের মতো গভীরভাবে কথামৃত অধ্যয়ন, কথামৃতের প্রবচন, অনুধ্যান অথবা সমস্ত দিন কথামৃত পাঠে উদ্‌যাপন প্রভৃতি ভক্তদের মধ্যে আজ দ্রুত কথামৃতের ভাবকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাঁদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে একটি উদার ভাবের সঞ্চার করছে। সংসারে থেকেও মানুষ অনায়াসে সংসারসাগর উত্তরণের সন্ধান পেয়ে শান্ত হচ্ছে। যারা সংসারে যুদ্ধ করছে তাদের প্রতি তিনি যে বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন! সকল শ্রেণির ভক্তের জন্যই তাঁর পাকা ব্যবস্থা ছিল, তাই কথায় কথায় নরেন্দ্রকে বললেন, ''আচ্ছা,—এখানে সব আছে, না?—নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।''[৩] যেমন দোকানদার সবরকম খদ্দেরের জন্য হরেকরকম আয়োজন করে রাখে, তিনিও ভক্তদের জন্য 'যার যেমন পেটে সয়' মনে রেখে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিচিত্র ব্যবস্থা

রাখতেন। কথামৃত সেই অমূল্য, বলতে গেলে অফুরন্ত ভাণ্ডার—শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কামকর্ম ও প্রেম-সমাধির দুর্লভ সম্পদ। সবরকম ভক্তের জন্যই ওই অমৃতকথার সংকলন করেছিলেন শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব একঘেয়ে ও একদর্শী নয়, এক উদার ভাবের মেলা, যেখানে জ্ঞানী-ধ্যানী-যোগী-ভক্তই শুধু নন, নানান ধর্মের মানুষও মিলিত হয়ে আপন-আপন ভাব সমৃদ্ধ করতে পারেন। আগেকার দিনে মানুষ গীতা অথবা ভাগবতগ্রন্থের পঠন-পাঠনে, অধ্যয়নে, কথকতায় জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, আজ একপাতা কথামৃত ধীরে ধীরে সেই শাশ্বত স্থানটি অধিকার করে নিচ্ছে। সচেতন পাঠক ভগবানকে জানতে তাই ওই বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। জানছেন শুনছেন মানুষী-তনুধারী সচ্চিদানন্দের চলা-ফেরার কথা। গীতায় অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞের কথা—

''স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধী কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥''

—সমাধিবান যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কী কথা বলেন, কেমন করে বলেন, কেমন করে সমাসীন হন, অথবা চলাফেরা করেন!

এবার কথামৃতে শ্রীম সেই আনন্দময় পুরুষের সব ছবিটাই তুলে রেখেছেন। তাই প্রতি পরিচ্ছেদেই সেই আনন্দময় পুরুষের আলাপচারিতা আনন্দের ঢেউ তুলেছে। ব্র্যাকেট দিয়ে অগণিতবার শ্রীম হাসি ধরে রেখেছেন—(সকলের হাস্য)। ভগবান স্বয়ং হাসছেন, তাঁর সান্নিধ্যে ভক্তদের অন্তরের আনন্দ-হাসি উথলে উঠছে। আর সেই কথামৃত পাঠ করে অগণিত মানুষের মুখে ফুটে ওঠে হাসির সূক্ষ্মরেখা—সে হাসি বোধের হাসি। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী জগন্নাথানন্দ, *শ্রীম-কথা* (মিত্র ও ঘোষ : কলকাতা, ১৩৪৮), পৃঃ ৩৪৭

২। তদেব, পৃঃ ৩৪০

৩। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০২), পৃঃ ১০৩০

শ্রীসারদা মঠ থেকে সদ্য প্রকাশিত হল

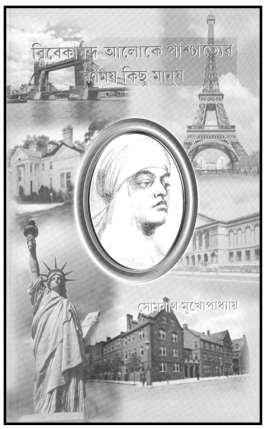

বিবেকানন্দ-আলোকে পাশ্চাত্যের বর্ণময় কিছু মানুষ

স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট কিছু মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র, স্মৃতিচারণ ও অভিব্যক্তির দর্পণে স্বামীজীর অপরিমেয় ব্যক্তিত্বের নানা দিক নতুনভাবে দেখার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। **লেখক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ মৌলিক গবেষণায় উঠে এসেছে এযাবৎ অনাবিষ্কৃত অনালোচিত বহু নতুন তথ্য।** এই গ্রন্থপাঠে পাঠকের মনে হবে—কোনও বিশেষ পরিচয়ের ঘেরাটোপে স্বামীজীকে ধরে রাখা যায় না—তিনি অনন্ত, তাঁকে চিনে নেওয়ার পথও অনন্ত। মূল্য : ৮০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর), সারদাপীঠ, উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার।